ছাত্র ইউনিয়ন কী ও কেন?

সম্পাদনায় | আসিফ জামান
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

প্রচারে | দুর্জয় রায়
প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

প্রকাশক | বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

সর্বশেষ প্রকাশনা | আগস্ট ২০২৬

ছাত্র ইউনিয়ন কী ও কেন?

শিক্ষা জীবনে একজন ছাত্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে তার শিক্ষা অর্জন করা এবং ছাত্রত্বকে অর্থবহ ও পরিপূর্ণ করা। শিক্ষার মাধ্যমে একজন ছাত্র সমাজ, মানুষ, পৃথিবী, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞানকে প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ-রাষ্ট্র, বিশ্ব সভ্যতা-বিশ্ব মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে পারার মাধ্যমেই ছাত্র জীবনকে ও শিক্ষাকে অর্থবহ করা সম্ভব।

সে অর্থে, ছাত্রত্বের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার মাধ্যেমে নিজেকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করা, যে মানুষটি তার সমগ্র জীবনে সৎ, দেশপ্রেমিক, মানবিক গুণাবলির অধিকারী, প্রগতিশীল, আদর্শবান, যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক পরিচয় বহন করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কোনো সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে। সময়ের কাজ যেন সময়ে করতে শেখে। বুঝে শুনে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করে। যুক্তিনিষ্ঠতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার নিরিখে পথ চলতে সক্ষম হয়। ছাত্রজীবন ও ছাত্রত্বকে অর্থবহ করতে হলেও একজন শিক্ষার্থীকে নিজের অধিকার এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নিজ স্বার্থেই তাকে অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে একাত্ম হয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের যোদ্ধা হয়ে উঠতে হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা এবং একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষার্থীদের এই সচেতন ও সংগঠিত করার কাজটি তার জন্মলগ্ন থেকেই করে আসছে। শিক্ষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীকে সচেতন করে তোলে। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা তার আন্দোলন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করে যে, যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা শিক্ষার অধিকার চাইছে, সেই ব্যবস্থার শাসকশ্রেণি শিক্ষার অধিকারকে সবসময় সংকুচিত করে রাখতে তৎপর। যেহেতু জনগণ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করলে, শিক্ষিত হলে, বিকশিত হলে নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই শোষকশ্রেণি কোনভাবেই চায় না দেশের ব্যাপকতর জনগণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, বিকশিত হোক। তাদের শাসন শোষণ কাঠামো টিকিয়ে রাখতে, তাদের ব্যবস্থার কেরাণি ও কর্মচারী তৈরি করতে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই তারা শেখাতে চায়। সে কারণেই গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষানীতি এ দেশে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার আগেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে।

অন্যদিকে আজকের সমাজে যে যতো বেশি তথাকথিত ‘শিক্ষিত’, সে ততো বেশি দুর্নীতিবাজ। গণবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা আজ শিক্ষাকে শুধু চাকুরি লাভের উপায়ে পরিণত করেছে। ছাত্রদের করেছে আত্মমগ্ন, স্বার্থপর একজন প্রতিযোগী হিসেবে। এই শিক্ষাব্যবস্থাই মানুষকে শেখায় দুর্নীতিবাজ হতে, মানুষকে ঠকাতে, নিজের স্বার্থের জন্য

অন্যেও অধিকারকে বলি দিতে। এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা মানবীয় গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরি সম্ভব নয়। আজকের সমাজব্যবস্থা, যে ছাত্রটি শিক্ষা নিয়ে এসব অব্যবস্থাপনা মেনে নিয়েছে তাকে নায়করূপে হাজির করে, আর যে ছাত্ররা এই অব্যবস্থাপনা না মেনে অধিকার ও শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-প্রতিবাদ ও আন্দোলন পরিচালনা করে তাদের চিহ্নিত করে বিশৃঙ্খলাকারী হিসেবে। সুতরাং অধিকার আদায়ের স্বার্থেই এই সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে করতে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা উপলব্ধি করে যে, বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিপূর্ণ অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। বিদ্যমান নয়া উদারবাদী বিশ্বব্যবস্থা, লুটেরা ধনিক শ্রেণির আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক-কূপমণ্ডুক-উগ্রজাতীয়তাবাদী দর্শনের বিরোধিতা না করে একটি বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী একই ধারার শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সে কারণেই ছাত্র ইউনিয়ন একটি শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেয়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পরিচয় নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে। শিক্ষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জায়গা থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র, এবং সে কারণেই দেশের ও সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের সংগ্রামের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্য একাত্মতা বোধ করে।

ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা মনে করে, সমাজ সভ্যতা বিকাশের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আজকের সমাজও বিকশিত হবে; একদিন একটি শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে– যে সমাজব্যবস্থায় একটি শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই একটি উজ্জ্বল, সুস্থ ও প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে গরিবের ওপর ধনীর শোষণ থাকবে না, থাকবে সম্পদের সুষম বণ্টন, যে যৌথ খামারের মালিকানা থাকবে সবার, প্রত্যেকে তার প্রাপ্য বুঝে পাবে। সেটি হবে সমাজের একটা নতুন উন্নত ব্যবস্থা। এই নতুন উন্নত সমাজে সাধারন শ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় ধনীরা নয়, সমস্ত মেহ-নতীরা। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আধুনিক প্রক্রিয়া দিয়ে সকলের কাজ হালকা হবে, কোটি কোটি জনগণের ঘাড় ভেঙে অল্প কয়েকজনের ধনবৃদ্ধি হবে না। এই নতুন, উন্নত সমাজকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই মতবাদকে বলা হয় সমাজতন্ত্র। ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্রে তাই উল্লেখ করা আছে, মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নিছক খাতায় নাম লেখানো ধরনের সংগঠন নয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, স্বাধীন ছাত্র গণসংগঠন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এই ছাত্র সংগঠন সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামসহ প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রেখে আসছে। লেজুরবৃত্তিক ছাত্র রাজ-নীতির ধারার বাইরে স্বাধীন ছাত্র গণসংগঠন হওয়ায় ছাত্র ইউনিয়ন তার সিদ্ধান্ত

স্বাধীনভাবে নেয়ার সক্ষমতা রাখে এবং অধিকার ও শিক্ষার্থীদের যেকোন সমস্যায় দ্বিধাহীন চিত্তে অগ্রবর্তী হতে পারে। এই সংগঠন করতে হলে প্রথমত একজন ছাত্রকে তার ছাত্রত্ব রক্ষা করতে হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে, প্রথমে নিজেকে যুক্তিবান ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। শুধু তত্ত্ব চর্চা নয়, বাস্তব প্রয়োগ, সত্যিকার আন্দোলন, প্রতিবাদ ও আন্দোলন, ছাত্র সমাজ ও জনগণের মাঝে প্রত্যক্ষ কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শন ও সামাজিক কর্মযজ্ঞের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হয়ে ওঠার নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হয়। শিক্ষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। এভাবেই ছাত্র ইউনিয়ন যুগে যুগে অসংখ্য কর্মী তৈরি করেছে যাদের হাতে রচিত হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস! আপনি ছাত্র হয়ে থাকলে, গৌরবময় ইতিহাসের এই যাত্রায় আপনাকেও আমরা সহযোদ্ধা হিসেবে পেতে চাই!

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মূলনীতি

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চারটি মূলনীতি হলো—

১. ঐক্য ২. শিক্ষা ৩. শান্তি ৪. প্রগতি

(১) ঐক্য

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে যে, ছাত্রসমাজের মধ্যে ঐক্যই সবচাইতে বড় শক্তি এবং ছাত্রস্বার্থের পক্ষে একটি নূন্যতম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। ব্যাপক ঐক্যের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া ছাত্র ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে সবসময়েই উদ্যোগী ও প্রয়াসী।

(২) শিক্ষা

শিক্ষা জীবনের সমস্যা সংকটগুলো দূর করে দেশ ও জনগণের স্বার্থে একটি গতিশীল আদর্শ অধিকার ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছাত্র ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য। ছাত্র ইউ-নয়ন এমন অধিকার ও শিক্ষা ব্যবস্থা চায়, যেখানে শিশুকাল হতে একজন অধিকার ও শিক্ষার্থী প্রকৃত অধিকার ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, উন্নত জ্ঞান ও ধীশক্তি, প্রগতিবাদী ও বিশ্ব-মানবতাবাদী মানসিকতায় জাগ্রত হতে পারে। অধিকার ও শিক্ষা পণ্য নয়, সুযোগ নয়, ‘অধিকার’, এই মৌলিক শ্লোগান নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রসর হয়। গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম লক্ষ্য।

(৩) শান্তি

ভারসাম্যহীন পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হিংস্র থাবায় আক্রান্ত। পৃথিবীর দেশে দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির নেতৃত্বে চলছে শোষণ, চলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। সাম্রাজ্যবাদী মদদে মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা দুনিয়ায় প্রতিদিন অগণিত মানুষ

হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, এবং তাদের দোসরেরা বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নানাভাবে আগ্রাসন ও বিভাজন চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের তৈরি বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন একাত্ম। শান্তির জন্য আপোসহীন সংগ্রাম ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম মূলনীতি।

(৪) প্রগতি

সমাজ সভ্যতার সামনের দিকে অগ্রযাত্রাই হলো প্রগতি। মধ্যযুগীয় অন্ধকার কূপমণ্ডুকতায় ফিরে যাওয়া তো নয়ই, এমনকি চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বিদ্যমান স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হলো প্রগতিবিরোধী। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে তাদেরকে পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে, প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে চায়। ছাত্র ইউনিয়ন সমাজপ্রগতির সংগ্রামের সৈনিক।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

১. অসাম্প্রদায়িক গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার অধিকার ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।
২. শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা।
৩. ন্যায্যমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।
৪. শিক্ষাঙ্গনে সকল অধিকার ও শিক্ষার্থীর পরিচয় পত্র প্রদান করা।
৫. সকল শিক্ষার্থীর জন্য হেলথ কার্ড বরাদ্দ করা।
৬. সকল প্রকার যানবাহনে ৫০% ছাত্র কনসেশন প্রদান করা।
৭. শিক্ষা ও চাকুরিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সমধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৮. জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ করা।
৯. অধিকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করা।
১০. পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা শেষে কাজের নিশ্চয়তা দেয়া।
১১. নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
১২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে জাতীয়করণের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের আর্থিক সমস্যা সমাধান করা।
১৩. প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের প্রতিটি মানুষকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলা।
১৪. শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে বাড়ানো।
১৫. দেশের সর্বত্র আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করা এবং ছাত্রাবাসসমূহে সরকারি সাবসিডি নিশ্চিত করা।

১৬. শিল্প, ললিত কলা, নাট্যকলা, সংগীত ও চারুশিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো।
১৭. সর্বস্তরে মাতৃভাষায় অধিকার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মাধ্যমিক শ্রেণিতে মাতৃ ভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১৮. অপরাপর জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করা।
১৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
২০. শিক্ষা জীবনের উপযুক্ত কোনো একটি স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যে বাধ্যতামূলক সামরিক ও শিক্ষার ব্যাবস্থা করা।
২১. মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, গাফিলতি, অকর্মন্যতা ও দায়িত্বহীনতা কঠোর হস্তে দমন করা।
২২. সার্বিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়কে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা।

ছাত্র ইউনিয়নের আন্দোলন সংগ্রাম

ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম

’৫২-র ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই প্রগতিশীল বামপন্থী ধারার তরুণ ছাত্ররা এই আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তার সংস্পর্শে এসে ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তন-মননের ধারাও বিক-শিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালে যখন ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত গতি পায়। বামপন্থী প্রগতিশীল ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনকে সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত করার বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মাঝে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা ছাত্রদের বিকশিত হয়।

আন্দোলন চলাকালেই ভাষা সৈনিকরা উপলব্ধি করেছিলেন, রক্তেগড়া ঐতিহাসিক এই প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে যথাযথ পরিণতিতে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি ছাত্র গণসংগঠন। তাই ভাষা প্রতিবাদ ও আন্দোলনের সামনের সারির প্রগতিশীল চিন্তাচতনায় উজ্জীবিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ- নির্বিশেষে সকল অধিকার ও শিক্ষার্থীকে প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করতে পারে এমন একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যারা অনেকেই ছিলেন দেশভাগ পূর্ব ছাত্র ফেডারেশনের উত্তরসূরী।

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতি'- এই চার মূলনীতিকে ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্নে এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন কাজী আনোয়ারুল আজিম ও সৈয়দ আবদুস সাত্তার। এরপর ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে মোহাম্মদ সুলতান সভাপতি এবং মোহাম্মদ ইলিয়াস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সম্মেলনে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষার আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষার অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকারের শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে যে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। এই রিপোর্টে অত্যন্ত নগ্নভাবে শিক্ষা সংকোচনের কথা বলা হয়েছিলো। সেই শিক্ষানীতি বাতিল ও সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৭ সেপ্টেম্বর আইয়ুব প্রদত্ত অধিকার ও শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে হরতাল ডাকা হয়। সেদিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মোস্তফা, বাবুল ও ওয়াজিউল্লাহ। সেই দিনটিকে আজ দেশবাসী শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে। হাইকোর্ট সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে স্থাপিত শিক্ষা অধিকার চত্বর এই আন্দোলনের স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে।

১৯৮২ সালের নভেম্বরে স্বৈরাচার এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ড. আব্দুল মজিদ খান অত্যন্ত নগ্নভাবে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করে শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এই গণবিরোধী অধিকার ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ছাত্র সমাজকে আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষানীতি বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে স্মরণকালের বৃহত্তর ছাত্র মিছিল হয়। সেদিন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর ট্রাক উঠিয়ে দেয় এরশাদ সরকারের পুলিশ বাহিনী। শহীদ হয় দিপালী, কাঞ্চনসহ আরো অনেকে।

ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্ন সময়ে একই ধারার, গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে, এবং গেন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ- পণ্যায়নের বিরুদ্ধে, বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বদা সোচ্চার ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়া অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতকরণ, ইউ.জি.সি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রত্যাহার, শিক্ষাঙ্গনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, ক্লাসরুম সংকট নিরসন, সেশন জট নিরসন, অধিকার ও

শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরণ, শিক্ষকদের জীবনমান উন্নতকরণ, স্বল্পমূল্যে অধিকার ও শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতকরণ, বিজ্ঞান গবেষণাগার, কম্পিউটার ল্যাব নি-শ্চিতকরণ, অধিকার ও শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্র ইউনিয়ন।

সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটের বিরুদ্ধে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৭/৪ ধারা বাতিলের দাবিতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বেতন-ভর্তিফরমের মূল্য বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বাণিজ্যিক নাইট শিফট কোর্স চালু করার বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের সফল আন্দোলন সংগঠিত করেছে। করোনাকালীন সময়ে টিউশন ফি কমানো ও ছাত্রদের অনলাইনে ক্লাস করার ক্ষেত্রে সকলের জন্য ডিভাইস নিশ্চিত করার দাবি সহ ৪ দফা দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলে। এইসব আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতাকর্মী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রোষানলে পড়েছে, হামলা-মামলা বহিষ্কারের শিকার হয়েছে। আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে সবসময়েই আপসহীন থেকেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশে প্রথম যে ছাত্র সংগঠনটি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবিতে আওয়াজ তোলে তা হলো ছাত্র ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক দশক ধরে তাকে অনেকটা এককভাবেই বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করতে হয়েছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে নয়, বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারায় বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকারের আন্দোলনকে অগ্রসর করতে ভূমিকা রাখে ছাত্র ইউ-নিয়ন। '৬৬ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সারা বাংলার মানুষকে মুক্তি প্রতিবাদ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ১১ দফা রচনায়, '৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে বাংলার মানুষের জাগরণের অন্যতম রূপকার ছিল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সেসময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিশ্চিত করে তোলে আইয়ুব-মোনায়েম শাসনের চূড়ান্ত পরাজয়। তারপর থেকেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতির কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়। '

৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ বাঙ্গালি জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তরভুক্ত করা হয়। মার্চে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শুরু করে সশস্ত্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ডামি রাইফেল কাঁধে ঢাকার রাস্তায়

মহড়া দেয়। মহড়া শুরু হয় হাতে তৈরি গ্রেনেড দিয়ে। ২৫শে মার্চ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গ্রামে গ্রামে অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প প্রস্তুত করে। এছাড়া হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে দেশের সর্বত্র রাস্তায় ব্যারিকেড এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে নীল পতাকার অভিযাত্রীরা।

৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তার সর্বোচ্চ সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সর্বত্র অসীম সাহস আর ত্যাগের পরিচয় বহন করে তারা। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিলে গড়ে তোলে দেশের সর্ববৃহৎ গেরিলা বাহিনী। ২০ হাজার সদস্যের এ গেরিলা বাহিনী হাটে-মাঠে-ঘাটে অপদস্থ করে তোলে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী আর তার দোসর রাজাকার, শান্তিবাহিনী, আলবদর আর আলশামসদের। এছাড়াও সারা দেশের ১১টি সেক্টরের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য নেতাকর্মী। ঢাকার দুর্ধর্ষ 'ক্র্যাক প্লাটুন', বিভিন্ন সেক্টরের এফ. এফ বাহিনী, মেরিন গেরিলা বাহিনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা সবচেয়ে সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধার মর্যাদা অর্জন করে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গেরিলাযুদ্ধে এবং সম্মুখ যুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন হয়ে ওঠে দুর্বার। এমনি এক সময়ে ১১ই নভেম্বর কুমিল্লার বেতিয়ারায় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে হারিয়ে যান বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা নিজামউদ্দিন আজাদ, সিরাজুম মুনির সহ ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীর ৮ সদস্য। এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের অসংখ্য নেতাকর্মী শহীদ হন। সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বেও ছাত্রসমাজকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কওে ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের বহু ছাত্র সংগঠন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শাসকশ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের মৌল আকাঙ্ক্ষার সাথে বেঈমানি করলেও ছাত্র ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদেও স্বপ্ন সাধ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক লড়াই করে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনার ওপর যখনই আঘাত এসেছে তখনই সোচ্চার হয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। মুক্তিযুদ্ধেও সংকীর্ণ একদলীয় বয়ানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে গণচরিত্রকে সামনে এনে বিকল্প বয়ান তৈরির লড়াইকেও ছাত্র ইউনিয়ন এগিয়ে নিয়ে গেছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তির সাথে বিভিন্ন সময়ে শাসকশ্রেণির বিভিন্ন দল আপোস করলেও ছাত্র ইউনিয়ন আপোস করেনি। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গড়ে ওঠা ছাত্র তরুণদের গণজাগরণেও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আজো ছাত্র ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে শোষণ-বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রূপান্তরের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়ন

জন্মলগ্ন থেকেই সকল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন দুর্বার লড়াই করেছে, ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বৈরাচারের আগ্রাসী হামলায় শহীদ হয়েছেন আমাদের অনেক বিপ্লবী বন্ধু। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন শুরু থেকেই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো। ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, পরবর্তীতে ১১ দফা প্রণয়ন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছাত্র ইউনিয়ন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সময় সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে লড়াই সংগ্রাম করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। ৮৩ সালের ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ৯০-এ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্বৈরাচার এরশাদ পতনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলো ছাত্র ইউনিয়ন। ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করে। এসব আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা জেল-জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় ধরে ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসগুলোতে সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলন, সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ২০১৪, ১৮ ও ২৪ সালের নির্বাচনের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ছাত্রলীগ-যুবলীগ দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে, কারাবরণ করতে হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় ছাত্র ইউনিয়ন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে এবং ৪০টি জেলায় অধিকার ও শিক্ষার্থী-জনতাকে সংগঠিত করতে ভূমিকা পালন করে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় ছাত্র ইউনিয়ন। পুলিশী বাধা, ধরপাকড় উপেক্ষা করে সারাদেশে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে ছাত্র ইউনিয়ন। এ সময়ে সারাদেশে পুলিশ গ্রেফতার করে ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতাকর্মীকে। এরই ধারাবাহিকতায় কারফিউ ভেঙে দেশের আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণে ২রা জুলাই 'দ্রোহযাত্রা' করার উদ্যোগ নেয় ছাত্র ইউনিয়ন। এ লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটভুক্ত সংগঠনগুলোকে নিয়ে একের পর এক সভা করা হয় ক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক, শ্রমিক, নারী সংগঠনগুলোর সাথে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের প্লাটফর্ম 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক'-এ উদ্যোগে সাড়া দেয়। লাখো মানুষের অংশগ্রহণে দ্রোহযাত্রার সমাবেশ থেকে সর্বপ্রথম সরকার পতনের ১ দফা ঘোষণা করা হয় এবং সরকারকে পদত্যাগ করতে ২ দিনের

আল্টিমেটাম দেয়া হয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তীব্রতায় হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের সাহসী ভূমিকা ছাত্র ইউনিয়নের গৌরবের ইতিহাসের আরেকটি উজ্জ্বল স্মারক।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন

সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন মুক্তিকামীদের স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে আজও তৎপর। এই জন্য তারা তথাকথিত 'মুক্তবাজারের' জালে আবদ্ধ করে, বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ-ডব্লিউ টি ও প্রভৃতি সংস্থা ব্যবহার করে অর্থনৈতিক শোষণ পরিচালনা করে। বৈষম্য ও নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের মত দেশকে পদানত রাখতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়, দেশে দেশে যুদ্ধ বাধায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্রষ্টা ছিলো এই সাম্রাজ্যবাদ যেখানে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও চক্রান্তের বিরোধিতা করে আসছে। আমাদের দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব দূর করার জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নিরন্তর প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে চলেছে। পাকিস্তান আমলে সিয়েটো, সেন্টো চুক্তির বিরোধিতায় ছাত্র ইউনিয়ন ছিলো অগ্রগামী। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে মিলে মার্কিনীদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছিলো, তখন ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলো।

মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী সেই তৎপরতার ব্যাপারে বিশ্বের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষদের সচেতন করেছিলো ছাত্র ইউনিয়ন। স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন ভিয়েতনামের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে বাংলার মাটিতে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিবাদ ও আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে "সাম্রাজ্যবাদীরা চায় কি? মুক্তিকামী মানুষের রক্ত ছাড়া আর কি?" এই স্লোগান ধরে, প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে পৌঁছলে, তৎকালিন আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশ বাহিনি মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মীর্জা কাদের ও মতিউল ইসলাম শহীদ হন। রাজধানীর তোপখানা রোডে মতিউল-কাদের ভাষ্কর্য রয়েছে। সেই থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি দিবস পালন করে আসছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ২০০১ সালে ভিয়েতনাম সরকার শহীদ মতিউল-কাদেরকে সে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছে।

দেশে দেশে পরিচালিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনগণের মুক্তি প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পাশে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সবসময়ই দাঁড়িয়েছে। প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, দক্ষিণ

আফ্রিকা, মোজাম্বিক, এঙ্গোলা, কিউবা, নিকারাগুয়া, লাওস, কম্পুচিয়া, ইরাক, আফ-গানিস্থানসহ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশেমুক্তিকামী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। ঐ সব দেশের সাধারণ মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সব সময়ই সংহতি প্রকাশ করে আসছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। যুদ্ধ নয়, বিশ্ব শান্তিই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কাম্য।

সাম্প্রতিক সময়ে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির হাত থেকে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর-খনিজ সম্পদ রক্ষার জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে ছাত্রসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। এশিয়া এনার্জির হাত থেকে ফুলবাড়ির কয়লা সম্পদ রক্ষায় ফুলবাড়ির জনগণের গণপ্রতিরোধের সাথে দেশব্যাপী প্রতিরোধ পর্ব রচনায়, সমুদ্রের গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে, তেল-গ্যাস সম্পদ রপ্তানি রুখতে, সুন্দরবন রক্ষায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন গোপন চুক্তি প্রকাশের দাবিতে আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, হামলা-মামলা-নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্ম ব্যবসায়ী, উগ্র জঙ্গিবাদ ও ফতোয়াবাজদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে আসছে। ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ছিলো অগ্রগণ্য। সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প রুখতে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান জন্মলগ্ন থেকেই প্রকাশ্য। যেকোন সাম্প্রদায়িক হামলা, দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন সবসময়েই আপোসহীনভাবে লড়াই করেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডুকতা দূর করার চেষ্টা করেছে। এ কারণেই বারবার প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির অন্ধ আক্রমণের শিক্‌র হতে হয়েছে ছাত্র ইউনিয়নকে।

জামাত-শিবিরসহ উগ্র মৌলবাদী শক্তির হাতে শহীদ হয়েছে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শাহাদাৎকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নতুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনয়ন নেতা তপন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্জয় তলাপাত্রকে খুন করেছে এই বর্বর শক্তি। সিপিবির সমাবেশে বোমা হামলায় শহীদ হয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বিপ্রদাশ। সাম্প্রদায়িক শক্তির আঘাতে আহত, পঙ্গু হয়েছে বহু নেতাকর্মী। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে সবসময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে, ব্যাপকভাবে জনগণের, বিশেষত শ্রমজীবী জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ থেকে এসব অপশক্তিকে দূর করে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোকে উৎপাটন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে সচেতন করে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সমবেত প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নির-লসভাবে কাজ করে চলেছে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন

বৃহৎ অর্থে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক বলয় নির্মাণে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তার নিরলস প্রতিবাদ ও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিনির্মাণের কাজটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যাবস্থা উপনীত হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো এজন্য সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার উপর সবসময় আঘাত হানে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্কৃতি সংসদের জন্ম ১৯৫১ সালে। প্রকাশ্যে নিছক সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভ তুলে ধরা। সংস্কৃতি সংসদের বর্তমান নাম 'সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন'। সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের লক্ষ্য ছাত্র সমাজ ও জনগণের মধ্যে ভোগবাদী সাংস্কৃতিক বিপরীতে একটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। পাকিস্তান আমল সামরিক জান্তা যখন রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করে, তখন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই নিষেধাজ্ঞা রুখে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়প্রত্য রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা। ছায়ানট, উদীচী প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠায়, রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানসহ বাংলা নববর্ষের উদযাপনের ঐতিহ্য ও ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়াও পাকিস্তান আমলে 'আমার সোনার বাংলা...' গানটিকে জনপ্রিয় করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে স্কুল-কলেজে জাতীয় সংগীতের প্রচারড় প্রসারে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শহীদ মিনারের বর্তমান অঙ্গসজ্জার সূচনায়, 'অপরাজেয় বাংলা', 'সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাষ্কর্য' এসব বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নেরই ঐতিহাসিক কীর্তি। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়া গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের পরিবেশনা দেশবাসীকে ৭১'র মুক্তি প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মতই উদ্বেলিত করে। ভোগবাদী সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহের বিপরীতে বাঙ্গালীর এবং বাংলার শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মেহনতি মানুষের হাজার বছরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিবাদ ও আন্দোলন আজও নিরন্তর।

সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবাদ ও আন্দোলন

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নানা ধরনের আন্দোলনের পাশাপাশি 'অধিকার ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসবিরোধী' আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

যখনই কোনো অধিকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তখনই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তা প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। এই আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় প্রেরণার নাম শহীদ মঈণ হোসেন রাজু। ১৯৯২ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তার তখনকার যুক্ত মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু শহীদ হন। সেই রাজুর স্মৃতিতে টিএসসিতে মাথা উঁচু কওে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু স্মারক ভাস্কর্য। এছাড়াও রুবেল, নতুন, প্রোটন দাশগুপ্ত, সুজন মোল্লাসহ আরো অনেক বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের সময়েও, ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীরা, ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুকচিতিয়ে লড়াই করেছে। এ সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্রলীগ-যুবলীগের পেটোয়া বাহিনীর হাতে ছাত্র ইউনিয়নের অসংখ্য নেতাকর্মী আহত হন। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে ছাত্র ইউনিয়ন আজো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ১৯৯৮ সালে ছাত্রলীগ কর্তৃক জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ২০০২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল আন্দোলন, ২০১০ সালে ইভটিজিং-এর নামে যৌন হয়রানি বন্ধের দাবিতে আন্দোলন, ২০১৫ পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আফসানা ফেরদৌস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনু, ধর্ষন এবং হত্যার শিকার হলে, ছাত্র ইউনিয়ন বিচাররের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ২০১৮ সালে নোয়াখালির সুবর্ণচরে গৃহবধু ধর্ষনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সহ অন্যান্য বামপন্থি সংগঠনগুলো সুবর্ণচর লংমার্চের কর্মসূচী নেয়। সেই কর্মসূচীতে আওয়ামীলীগ হামলা করলে ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা কর্মী আহত হোন। ২০২৩ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন সংগঠিত করেন। এছাড়াও নারীদের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

জনগণের পাশে ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ইউনিয়ন যেকোন দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। করোনা মহামারীর সময় ছাত্র ইউনিয়নের ভলান্টিয়াররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছে। স্যানিটাইজার তৈরি, অক্সিজেন সরবরাহ, হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবামূলক সহায়তা, দুস্থদের খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন উপায়ে মানুষের পাশে থেকেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ছাত্র ইউনিয়ন নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছে।

এদেশের মেহনতি মানুষের বিভিন্ন লড়াই সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন সংহতি জানিয়ে তাদের পাশে থেকে লড়াই করেছে। গার্মেন্ট শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রমিকের আন্দোলন, রিকশাশ্রমিকের আন্দোলন, কৃষক- ক্ষেতমজুরদের আনেদালনে যথাসম্ভব পাশে থেকেছে ছাত্র ইউনিয়ন।

এদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছেন, সত্য বলার কিংবা প্রকাশের জন্য যাদের উপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের খড়গ তাদের পাশে দাঁড়াতে ছাত্র ইউনিয়ন কখনোই দ্বিধাবোধ করেনি।

বিশ্বের ছাত্র সমাজ ও ছাত্র ইউনিয়ন

সাম্রাজ্যবাদি, পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, জাতীয় অধিকার, প্রগতি ও আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানে তারা মানব সভ্যতাবিরোধী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। কোথাও ঘৃণ্য গণহত্যার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। এরা বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় বিভেদ, জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি করে। নানা প্রতিকূল অর্থনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দিয়ে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির জালে আবদ্ধ করে ও বিভিন্ন কলাকৌশলে তারা নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। এই দুশমনদের প্রতিহত করার জন্য এবং দেশে দেশে মানুষের স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, শান্তি ও প্রগতির লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সমাজের ঐক্য এবং নিপীড়িত ও মুক্তিকামী জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা। এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি প্রতিবাদ ও আন্দোলনের সঙ্গে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীন সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS), বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (WFDY), এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ASA), এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত অনলাইন যোগাযোগের ভিত্তিতে নানা প্রগতিশীল ও বামধারার ছাত্র সংগঠনের দ্বারা গড়ে ওঠা International Students' Movement (ISM)—এর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নয়া উপনিবেশিক শোষণ রুখে দাঁড়ানো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুদ্ধ-চক্রান্ত ও যুদ্ধের পাঁয়তারা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারমাণবিক অস্ত্রসহ সকল ধরনের অস্ত্র

প্রতিযোগিতার অবসান, পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা, বৃহৎ শক্তিগুলোর সামরিক বাজেট হ্রাস করে দরিদ্র দেশসমূহের উন্নতির জন্য তার অংশ ব্যয়, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ও ঘাঁটি উচ্ছেদ, দেশে দেশে অগণতান্ত্রিক বন্দীশালা উচ্ছেদ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োগের জন্য বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-প্রগতিশীল শক্তির প্রতিবাদ ও আন্দোলন জোরদার করতে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রগতির প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বদাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা

২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে আন্দোলনকারীদের উপর একযোগে হামলা করে সরকারদলীয় সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ। পরদিন রাষ্ট্রীয় বাহিনী পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ, এতে আন্দোলন দমে না গিয়ে স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সারা দেশের ৪০টি জেলায় শিক্ষার্থী-জনতাকে সমন্বিত করে। ১৭ জুলাই রাত থেকে দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধ করার দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে আন্দোলন চালিয়ে নিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয় ছাত্র ইউনিয়ন। ১৬ থেকে ১৮ জুলাই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলে দেশব্যাপী।

১৯ জুলাই থেকে শুরু হয় কারফিউ। বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রদের ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব আত্মগোপনে চলে গেলেও সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগে অটুট থাকে ছাত্র ইউনিয়ন। ২৬ জুলাই ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংস্কৃতিকর্মীরা কারফিউ ভেঙে গানের মিছিল করা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরদিন আবার কারফিউ ভাঙে শ্রমিক ও নারী সংগঠনগুলো। গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের উদ্যোগে মিছিল হয় ২৮ জুলাই। পুলিশী বাধা, ধরপাকড় উপেক্ষা করে সারা দেশে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে ছাত্র ইউনিয়ন। এ সময়ে সারাদেশে পুলিশ গ্রেফতার করে ছাত্র ইউনিয়নের বহুনেতাকর্মীদের।

এরই ধারাবাহিকতায় কারফিউ ভেঙে দেশের আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণে "দ্রোহ-যাত্রা" করার উদ্যোগ নেয় ছাত্র ইউনিয়ন। এ লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটভুক্ত সংগঠনগুলোকে নিয়ে একের পর এক সভা করা হয় ক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক, শ্রমিক, নারী সংগঠনগুলোর সাথে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের মাধ্যম 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' এ উদ্যোগে সাড়া দেয়। লাখো মানুষ ষের অংশগ্রহণে দ্রোহযাত্রার সমাবেশ থেকে তৎকালীন সরকারকে ২ দিনের আলটিমেটাম দেয়া হয়। আলটিমেটামের দুদিন পরেই অর্থাৎ আগস্ট মাসের ৫ তারিখ শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগ করে ও পালিয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞা

দীর্ঘ ১৫ বছর একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চলমান থাকার পর ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টের ছাত্র জনতা বিতাড়িত করেছে স্বৈরাচারী হাসিনাকে। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী খুনি সরকারকে উৎখাত করতে আমাদের হারাতে হয়েছে অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে, যারা নিজ দেশের মানুষের জন্য, সুন্দর আগামীর জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। আহত হয়েছেন হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। এই গণঅভ্যুত্থানে চার বছরের শিশুও রক্ষা পায়নি শাসকের গুলি থেকে। শহীদ শিশু- কিশোররা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের জন্য যে ঋণ রেখে গেছেন, সেই ঋণ পরিশোধের উপায় একটিই। আর সেই উপায় হচ্ছে সকল প্রকার বৈষম্যহীন, একটি সমৃদ্ধ দেশ তৈরি করা। যে দেশে কৃষককে আত্মহত্যা করতে হবে না, শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দেওয়া হবে না, চাকরির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে না তরুণ-তরুণীদের, চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না একটি মানুষও। যেই দেশের অধিকার ও শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত। গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক যে শিক্ষাব্যবস্থায় সুনাগরিক ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠবেন প্রত্যেক অধিকার ও শিক্ষার্থী।

১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ রাতে থেকে শুরু হওয়া পাক বাহিনীর গণহত্যায় শহীদ হন ৩০ লক্ষ মানুষ। ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানুষেরা কল্পনাও করতে পারেননি যে নিজ দেশেই কোনো অনির্বাচিত সরকার দিনে দুপুরে সরাসরি গুলি করে মানুষ হত্যা করবে। এত হত্যা নির্যাতন চালিয়েও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি স্বৈরাচার, মানুষের সম্মিলিত আকাঙক্ষার কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়েছে।

স্বৈরাচারের পতন হয়েছে, কিন্তু আমাদের লড়াই থামেনি। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমরা সকলে খেয়াল করেছি ছাত্র-জনতার এই অর্জনকে নিজেদের পকেটে ঢুকানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে নানারকম রাজনৈতিক মহল। উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিতে চেষ্টা করছে। স্বৈরাচার পরবর্তী এই সময়ে এসে তাই আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সদ্য পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারীর রেখে যাওয়া জুতোয় কেউ পা গলাতে না পারে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাতে ব্যহত না হয়।

প্রকৃত শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটাতে হবে। প্রতিদিনকার লড়াই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই পথে হাঁটার কোন বিকল্প নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের সেই লড়াইকে অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের শপথনামা

লাখো লাখো শহীদ যাঁরা ভাষা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'জীবন' কে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের রক্তের নামে আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, সেই সকল বীর শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থেকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে চলবো।

আমরা আরো শপথ গ্রহণ করছি যে, এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে প্রয়োজনবোধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবো। শিক্ষা-গণতন্ত্র-সমাজপ্রগতির লড়াইকে এগিয়ে নেবো- শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নে-

আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো।

আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো।

আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সংগীত

কথা : আখতার হুসেন
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

আমরাতো **ঐক্যে**র দৃঢ় বলে বলীয়ান
শোষণের কারাগার ভাঙবোই
শিক্ষার আলোকে প্রতি গৃহকোণকে
রাঙবোই আমরা তো রাঙবোই।
হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই
হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই
আগে বাড়ো আগে বাড়ো
দুর্জয় দৃঢ়তায় আর নয় দেরি নয়
আমাদের হবে জয়
এসে মিলি মুক্তির পতাকায়।।
আমরাতো **শান্তি**র দুর্বার সৈনিক
শুনি না তো আহ্বান ধ্বংসের
আমরা তো আমরণ **প্রগতি**র পক্ষে
গড়বোই বিশ্বতো সাম্যের
হাতে হাত রাখো ভাই (...)
আমরা স্বদেশের দুর্জয় প্রহরী
স্বদেশের মাটি তাই গরীয়ান
আমাদের অবিরাম শ্রমে আর ফসলে
ফোটাবোই স্বদেশের মুখে গান
হাতে হাত রাখো ভাই (...)
আমরা তো মিলেছি পৃথিবীর লাঞ্ছিত
সংগ্রামী মানুষের কাফেলায়
যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই
আমরা তো মিলি লৌহ দৃঢ়তায়
হাতে হাত রাখো ভাই (...) ।।

পরিশিষ্ট

দাস প্রথা

দাস প্রথা প্রাচীনকাল থেকে মানবসভ্যতার এমন এক অধ্যায় যেই অধ্যায় মানুষকে শিখিয়েছে অন্য মানুষকে পণ্য করতে। দাসপ্রথায় একজন দাস মালিক তার অনুগত দাসকে নিজের সম্পত্তির মতই দেখতো। দাসেরা মালিকের খায়েশ অনুযায়ী সকল রকমের কাজ করতে বাধ্য থাকতো। দাস প্রথার শুরুটা হয়েছিলো প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার হাত ধরে। তবে সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশের ফলে এক এলাকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে গিয়ে অন্য এলাকায় বিক্রি করে দেওয়ার বাণিজ্য শুরু হয়। আরব, আফ্রিকা, এশিয়া সহ সমগ্র পৃথিবী থেকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হতো সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের কাছে।

মানব সভ্যতার এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় মুলত সমাজে 'শ্রেণি' তৈরি হওয়ার মাধ্যমে। সমাজে রাজনৈতিক, সামজিক, আর্থিকভাবে তুলনামুলক দূর্বল মানুষদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এমনকি বাংলায়ও দাস প্রথার প্রচলন ছিলো। সেসময় গবাদিপশুর মতোই মানুষকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হতো। প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মই দাস প্রথাকে সমর্থন করায় এই অমানবিক প্রথাটি চরম রূপ ধারণ করেছিলো। বিশেষ করে হাবশি, কাফ্রি, চাইনিজ, আরাকান, মালয়দের দাস হিসেবে বাংলায় বেশ চাহিদা ছিলো সেসময়। রাজা-বাদশারা তাদের হারেমের নিরাপত্তার জন্য ক্রীতদাসদের খোঁজা করে রাখতো। নিয়মিত শ্রমিকদের বদলে ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ আদায় করালে কম খরচে অধিক মুনাফা লাভ করা যেতো বলেই দাস প্রথা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। ক্রীতদাসদের দাস মালিকের গৃহস্থালির কাজ, কৃষিকাজ ও অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নিজেদের বিকৃত যৌনাচারের অংশ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। এর বাইরেও ক্ষমতা কাঠামো ও সামাজিক প্রতিপত্তির এক পরিচায়ক হয়ে উঠতে শুরু হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন দাসেরা।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করে। দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এর বীজ এখনো সমাজে প্রবলভাবেই বিদ্যমান। এখনো ধনীকশ্রেণির পুঁজিবাদীরা মানুষকে পণ্য হিসেবেই দেখে। এখনো সারা পৃথিবীতে শত শত কোটি মানুষকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয় শুধুমাত্র শ্রেণিশোষণের কারণে।

সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজম

উৎপাদন যন্ত্রে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বা সোস্যালিস্ট সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফাকে প্রধান উদ্দেশ্য করে পণ্য উৎপাদন করা হয় অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পণ্য উৎপাদিত হয় ব্যবহারের জন্য। সমাজতান্ত্রিক

সমাজে চাহিদা বা অভাব অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকার ও শিক্ষার ভার রাষ্ট্র নেয় ফলে সবাই সমানভাবে অধিকার ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়। যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রায় সব মানুষের জীবনই খেলনা সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের জীবন ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ। কাজ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। তবে সবচেয়ে বেশি আয় করা লোক আর সবচেয়ে কম আয় করা লোকের পার্থক্য থাকে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সবচেয়ে কম।

সাম্যবাদ বা কমিউনিজম

সমাজতান্ত্রিক সমাজই বিকশিত হয়ে সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হবে। সাম্যবাদী সমাজে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতোই পরিকল্পনা করে পণ্য উৎপাদন করা হবে। কিন্তু বণ্টনের নিয়ম কিছুটা বদলে যাবে। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকেই তার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আয় করবে ও যার যে পরিমাণে জিনিসপত্র দরকার সে পরিমাণেই পাবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন যন্ত্রের উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকে। সক্ষমতা থাকলে যে কেউ সমাজের যে কোনো কাজ করতে পারবে। ফলে ধীরে ধীরে শ্রেণিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শ্রেণির বিলুপ্তির ফলে রাষ্ট্রও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যদি সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত না হয় তাহলে রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হবে না। কারণ তখন ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে দখল করে নেবে। কাজেই সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকেই প্রথমে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হতে হবে। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের বিকল্প কিছু একটার জন্ম হবে। সবাই মিলে আইন-কানুন তৈরি করবে ও সবাই তা স্বেচ্ছায় মেনে চলবে। পুলিশ-সেনাবাহিনী-জেলখানা কোনোকিছুরই আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না সাম্যবাদী সমাজে। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির ফলে পুরো পৃথিবী একটিমাত্র দেশে পরিণত হবে।

পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম

যা কিনে নেয়া যায় তাই পণ্য। পণ্য যা থেকে তৈরী করা হয় তাই উৎপাদন যন্ত্র। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জায়গা-জমি ইত্যাদি উৎপাদন যন্ত্র হতে পারে। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যাক্তিগত অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতেই পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম গড়ে ওঠে। উৎপাদন যন্ত্র যখন ব্যাক্তিগত মালিকানায় থাকে তখন তাকে বলা হয় পুঁজি বা ক্যাপিটাল। পুঁজির মালিককে বলা হয় পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া। পুঁজির মালিকদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন। পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে যে সমাজে পণ্য তৈরী হয় সেই সমাজকেই বলা হয় পুঁজিবাদী বা ক্যাপিটালিস্ট সমাজ। পুঁজিবাদ কিছু মানুষকে ধনী করে বেশিরভাগ মানুষকেই গরিব করে দেয়। ক্যাপিটালিজম অনেক সময় শ্রমিকদের বৃহৎ অংশকেই বেকার করে দেয়। পুঁজিবাদ নতুন চাহিদা সৃষ্টি

করে, ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের শ্রমিকে পরিণত করে ও যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এসব কারণসহ আরো নানা কারণে পুঁজিবাদী সমাজে দুটি শ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. যারা নিজেদের শারীরিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আয় করে অর্থাৎ যারা শ্রমজীবী বা সর্বহারা।
২. যারা পুঁজির মালিক বা পুঁজিপতি।

সাম্রাজ্যবাদ বা ইম্পেরিয়েলিজম

পুঁজিবাদ তার নিজের প্রয়োজনেই খুব দ্রুত বিকশিত হয়। নতুন নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হতে থাকে। ফলে সমাজে যথেষ্ঠ পরিমাণে পণ্য তৈরি হয়। কিন্তু এইসব পণ্য কেনার সামর্থ্য অধিকাংশ মানুষেরই থাকে না। ফলে এইসব পণ্যে বাজার বোঝাই হয়ে গেলেও ক্যাপিটালিস্টদের লাভ আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য হয়েই ক্যাপিটালিস্টরা পণ্য বিক্রির জন্য অন্যদেশে বেরিয়ে পড়ে। তারা পণ্য বিক্রির জন্য এমন দেশ বেছে নেয় যেখানে পুঁজিবাদ যথেষ্ঠ পরিমাণে বেড়ে ওঠেনি। কারণ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোতেও তাদেরই মতো অবিক্রিত পণ্যে বাজার বোঝাই হয়ে থাকে। অ-ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে এসে নিজস্ব পণ্য বিক্রি করতে চায়। ফলে বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিস্টদের মধ্যে পণ্য বিক্রি নিয়ে প্রতিযোগিতার আরম্ভ হয়। ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোত প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতায় জিততে চায়, ফলে তাদের অক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোর সরকার দখলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোর অধীনে পড়ে থাকা অ-ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে বলা হয় অধিপতি দেশের 'উপনিবেশ' বা 'কলোনি'। কোনো ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্র যখন অতিরিক্ত পণ্য বিক্রির জন্য, অতিরিক্ত পুঁজি খাটাবার জন্য, সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য অ-ক্যাপিট-ালিস্ট রাষ্ট্র দখল করে নেয় তখন সেই দখলকারী রাষ্ট সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র।

ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদ হলো একটি কট্টর ডানপন্থি, কর্তৃত্ববাদী, এবং অতি-জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আন্দোলন, যা একজন স্বৈরাচারী নেতা, কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার, সামরিকবাদ, বিরোধীদের জোরপূর্বক দমন, পরাধীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা জাতির 'স্বার্থে' শক্তিশালীভাবে ব্যক্তি স্বার্থ দমন এবং সমাজ ও অর্থনীতির রেজিমেন্টেশন। গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ,উদারতাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ বিরোধী, ফ্যাসিবাদ প্রথাগত বাম-ডান বর্ণালীর একেবারে ডানদিকে।

বামপন্থী

বামপন্থী রাজনীতি এমন রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিসরকে বর্ণনা করে, যা সামাজিক সাম্য এবং সাম্যবাদ অর্জনের জন্য সমর্থন করে এবং চায়, প্রায়শই সামগ্রিকভাবে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের বিরোধিতা করে।